ইলোরা কথা

প্রমথেশ চন্দ্র

দূরে যে পাহাড়টা দেখা যাচ্ছে তার নাম চরণদারী পাহাড়। আধুনিক পীচ পথ না থাকলে ভ্রমণার্থীরা বুঝতেও পারতনা ঐ খানেই লুকিয়ে আছে বিশ্বের বিস্ময় পাহাড় কাটা এক প্রস্তর। বৃহত্তম উন্মুক্ত স্থাপত্য সেখানেই শেষ নয় তার দুপাশে আরো আছে তেত্রিশটা পাহাড় কাটা স্থাপত্য। পাহাড়ের উপরে আরো আঠারোটা গুহা পবিত্র জলধারার দুপাশ জুড়ে অবস্থান করছে।

সুদূর অতীতে এই ধরনের পাহাড় কাটা স্থাপত্যকে বৌদ্ধধর্মাবলম্বীগন 'গুম্ফা' নামে অভিহিত করেন। যার বাংলা সংস্করণ 'গুহা'। শব্দটা কানে এলেই মনে হয় যেন প্রাগৈতিহাসিকতার আশ্রয়স্থল। এই ভ্রান্তিময় স্বপ্ন দর্শন শৈশব থেকেই শু হয় এবং সেই সমাপ্তি ঘটে অজন্তা বা ইলোরার গুহাস্থাপত্যের সামনে দাঁড়ানোর পর এবং তারপর বাস্তবকে ভ্রম বলে মনে হতে থাকে।

ঐ যে একদল ভ্রমণকারী দর্শনার্থী নামছেন বিলাসভ্রমণ বাস থেকে হৈ হৈ ক'রে। একজন প্রদর্শক তাঁদের নিয়ে চলেছেন, তঁার গলায় রেফারীর বাঁশি। তাঁরা এগিয়ে চলেছেন। ইতিমধ্যে বাসের কোনও এক গোপন কুঠরি বেরিয়ে এসেছে একটা গ্যাস সিলিন্ডার, স্টোভ, রান্নার সরঞ্জাম। রান্না শু হয়ে গেলো। রান্না সমাপ্ত হলেই ভ্রমণার্থীদের চলে আসতে হবে বাসে। সেখানে তাঁদের দ্বিপ্রাহরিক খাদ্য গ্রহণ সমাপনান্তে বাস ছেড়ে চলে যাবে গোয়ার পথে। বাসটা আসছে অজন্তা থেকে। এই ভ্রমণার্থীরা সকালে দেখে এসেছেন অজন্তা এখন দেখছেন ইলোরা।

পথপ্রদর্শক বাঁশি বাজাচ্ছেন। তিনি সমবেত দর্শনাথীদের উদ্দেশ্যে কিছু বলতে চান। দর্শকেরা এখন শ্রোতার ভূমিকাপালন করছেন। একটু বাদেই তাঁরা শুনতে পাবেন বাসের আহ্বান। শ্রুতি পথে প্রবেশ করেছে 'ইহাই সেই বিশ্ববিখ্যাত ইলোরার সর্বশ্রেষ্ঠ কৈলাস মন্দির। এক হাজার বৎসরেরও অধিক পূর্বে ইহা নির্মিত হয়। ইহা সম্পূর্ণ পাথরের তৈরি। (বলতে বলতে এগিয়ে চলেছেন, হঠাৎ খিলান শ্রেণীর সামনে দাঁড়ালেন) এই থামটায় একটা চাঁটি মান। (এক উৎসাহী যুবক চাঁটি মারল, শব্দ থম্-ম্-ম্) এবার এই থামটায় চাঁটি মান। (চাঁটি পড়ল, শব্দ হ'ল তম্-ম্ম্) এবার ঐ থামটায় চাঁটি ও শব্দ দম্-ম্-ম্), তার পরেরটায় (তান্-ন্-ন্, চারিদিকে স্বগতোক্তির গুঞ্জন ধবনি), আসুন আমার সঙ্গে।' দর্শক চললেন আরো কিছু অবাক হতে।

এদিকে মন্দিরের উপরে রাগমালা অলঙ্কারের আভরণে সেজে বসেছে, যেন যৌবনের সংহত তেজে তার শৌর্যবান সত্ত্বা দীপ্তমান। সহস্রাধিক বৎসর কেটে গেছে কবে, কি যায় আসে তাতে। কোন প্রদর্শক কি বোঝাচ্ছে, কোন কলমচি কি লিখছে কিছুতেই কিছু যায় আসে না তার। তার মহত্তম গাম্ভীর্য, সংযম, শক্তির সম্মেলন স্তম্ভিত করে দিতে পারে বিশ্বের এতাবৎ কালে রচিত সকল স্থাপত্যকে। সহস্র কোটি ঠুনকো জীবনের পাশে এক মনুষ্যসৃষ্ট মহামহিম বিস্ময় বড় অপরূপ। বিস্ময়কর পরিকল্পনা, বিস্ময়কর শ্রম ও দক্ষতা, বিস্ময়কর নান্দনিক অভিঘাত।

এই স্থানের প্রাচীন নাম ছিল বেল (ব-এর উচচারণ এখানে ওয়)। অজন্তা গুহাগুলির মতো ইলোরার গুহাগুলি পুনরা বিষ্কৃত হয় নি।

সেকাল থেকেই মানুষ এই স্থানের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করে এবং সেই আকর্ষণ আজও অপ্রতিহত। শিল্পানুরাগী মানুষের এই তীর্থস্থান প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধ'রে করে চলেছে নান্দনিক সৌন্দর্যের বিকিরণ।
এখন আমাদের সামনে ইলোরার গুহামালা।এই গুহামালা দক্ষিণ থেকে উত্তরে প্রসারিত। দক্ষিণ প্রান্ত থেকে বৌদ্ধগুহা স্থাপত্যগুলি শু হয়ে ক্রমে হিন্দু গুহা স্থাপত্য ও উত্তরপ্রান্তে জৈন গুহা স্থাপত্য হয়ে সমাপ্ত হয়েছে।

ঐতিহাসিক পটভূমিকা এবং ভৌগোলিক অবস্থান নির্ণয় না করলে ভারতবর্ষের মতো এক বিশাল দেশের বিপুল সৃষ্টি সম্ভারের বৈচিত্র্যকে বুঝতে অসুবিধা হতে পারে। কারণ কাছাকাছি একই সময়ে নির্মিত হয়েও মধ্য প্রদেশের খাজুরাহো ওড়িশা, দক্ষিণ পূর্ব ভারত, আরাবল্লি ইত্যাদি স্থানের মন্দির স্থাপত্যের গাঠনিক ও নির্মাণ কৌশল ভিন্ন প্রকারের। এর কারণ অধিকাংশই স্থানিক অর্থাৎ ভৌগোলিক অবস্থানের ভিন্নতা অন্যান্য কারণ হিসেবে রয়েছে নৃতাত্ত্বিকবৈচিত্র্য, রাজনৈতিক অবস্থান, সামাজিক রীতিনীতি। এই বিচ্ছিন্নতার মধ্যেও রয়েছে একটা লক্ষনীয় সাদশ্য যে সাদৃশ্যেই নিহিত আছে তৎকালীন ভারবর্ষের সামগ্রিক সংস্কৃতির ঐক্য।

মহারাষ্ট্রের ঔরঙ্গাবাদ জেলার একটা ক্ষুদ্র গ্রামের নাম ইলোরা। এমনিতেই মহারাষ্ট্রে নানা স্থানে বড়, মাঝারি, ছোটো পার্বত্য প্রদেশ ও টিলা ছড়িয়ে আছে। সমতলভূমি সর্বত্র মেলে না। এখানকার প্রকৃতি ক্ষ ও শুষ্ক ফলে চাষাবাদবড় কষ্টসাধ্য ব্যাপার। মুম্বাই এখান থেকে সুদূর না হ'লেও মুম্বাই-এর ছায়া ইলোরাতে প্রায় পড়ে না বললেই চলে।সাধাণভাবে মারাঠি জাতি নাতিদীর্ঘ , সুঠাম, কষ্টসহিষ্ণু এবং পরিশ্রমি। এই স্থান এবং এই স্থানের মানুষ সহস্রাধিকবৎসর পূর্বে কেমন ছিল ভাবতে ভাবতে ঘটে গেছে বৈদেশিক আত্রমণ, রক্ত ও সংস্কৃতির সংমিশ্রণ, ঘটে চলেছে আজও তবু সেই মানুষের অবয়বে আজকের চেনা মানুষকে খুঁজে পাই। খুঁজে পাই সেদিনের শিল্পীদের শরীর, মন।

মহারাষ্ট্রের নানা স্থানে প্রাচীন সভ্যতার চিহ্ ছড়িয়ে আছে। অজন্তা, ইলোরা ছাড়াও আছে এ্যালিফেন্টা, বাগ, কার্লে, ভাজা ঔরঙ্গাবাদের গুহামালা, পিত্তল খোড়া' আছে দেবগিরি দুর্গ ইত্যদি নানা স্থান। এছাড়াও আরও যে কত স্থানে পুরাতন লুকিয়ে আছে কে জানে! কবে কোন মাটির স্তুপ, গুল্মলতার ঝোপ সরিয়ে বেরিয়ে আসবে অতীত সভ্যতার আরো কথামালা তার অপেক্ষায় থাকি। রহস্যময় লাগে এখানকার পার্বত্য খাঁজ।

পর্শ্ববর্তী চিত্র দেখলে প্রতিটি গুহায় প্রবেশের পথ নির্দেশ কিছুটা বোঝা যেতে পারে। আজকের এই পীচপথ সেদিন ছিল গুল্মঝোপ আর আগাছায় পরিকীর্ণ। একদা এই জঙ্গলাকীর্ণ।পদ সঙ্কুল পর্বতমালার সামনে দাঁড়িয়ে কোনও মহান শিল্পী অনুভব করেছিলেন এখানেই রূপায়িত হতে পারে গুহাস্থাপত্য। পাহাড়ের নিরেট বাসল্ট -পাথরের গহনে লুকিয়ে থাকা মহৎ শিল্পসমূহকে কল্পনা করেছিলেন। স্থান নির্বাচন ক'রে শু হয়েছিল কাজ। এখানকার প্রতিটি গুহাস্থাপত্যই অসাধারণ। প্রতিটিই স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং নিজস্বতা নিয়ে একক। যে বিপুল প্রস্তর অতিমানবিক ত্রিয়ায় ছেদন ক'রে স্থাপত্য গুলি রচিত তা আমাদের চোখের সমানে নেই। কল্পনায় অতীত বাস্তবতায় প্রবেশ কন অমিতবলশালী মানুষেরা ছেনি বাটালী আর হাতুড়ি দিয়ে অবিরাম আঘাত ক'রে চলেছে সুপরিকল্পিতভাবে। পর্যায়ত্রমিক আঘাতে লোহার ছেনি, বাটালী, হাতুড়ি সব উত্তপ্ত হ'য়ে উঠেছে। পাথরে লোহায় সংঘর্ষে ফিনিক দিয়ে ছিটকাচ্ছে আগুনের ফুলকি। পাথরের টুকরো ছড়িয়ে পড়ছে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তাকারে। একদল নরনারী ঝুড়িতে ক'রে সেই পাথর তুলে নিয়ে চলেছে অন্যত্র। প্রধান স্থপতির করা পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ চলছে। আর অধীনস্থ অন্যান্য স্থপতিগণ নির্ধারিত স্থানে কাজ করেছেন ও করাচ্ছেন।

সেই বিপুল কর্মযজ্ঞ কোথায়! কোন্ সহস্রাধিক বর্ষ আগে শত শত বছর ধ'রে যে কর্মযজ্ঞ চলেছিল তার কিছুমাত্র অবশিষ্ট নেই। ছেদন না করা অংশগুলোই শুধুমাত্র আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় বা হচ্ছে। এই যে সুবিস্তীর্ণ প্রদক্ষিণ পথ বা প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে আছি উপরের দিকে তাকালে দেখতে পাচ্ছি সুউচচ পার্বত্য খাদ। পাথরের গায়ে ছেনি-বাটালীর ছন্দ বদ্ধ কেটে চলার দাগ। এই স্থান একদা নিরেট পাথর ছিল, ছিল জমাট অন্ধকারের চাপ এখন এখানে প্রবাহিতহচ্ছে বাতাস, হেঁটে চলেছে

আমার মতো তুচ্ছ কোনও জীব। বিস্ময় উৎপাদিত হাঁ মুখটা বন্ধ করার উপায় কিছুতে নেই। তাই ব্যাখ্যা নেই। ভালো মন্দের বিচার নেই।

বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীগণ প্রথম ইলোরায় আসনে আনুমানিক পঞ্চম শতকের শেষার্ধে এবং তাঁরা ষষ্ঠশতকের প্রথমার্ধে স্থাপত্য খননের কাজ শু করেন নির্জন ও দুর্গম পার্বত্য প্রদেশের দক্ষিণ প্রান্ত থেকে। বারোটা গুহা স্থাপত্য তাঁরা খনন করেন সপ্তম থেকে নবম শতকের মধ্যে প্রথম চালুক্য ও রাষ্ট্রকূট রাজবংশের পৃষ্ঠপোষকতায়। এই প্রসঙ্গে ব'লে রাখা দরকার ইলোরা গুহাস্থাপত্যমালার মধ্যে সর্বপ্রথম খনন কার্য শু হয় ২৯নং হিন্দু গুহামন্দির 'ধুমার লোণা'তে এবং সম্ভবত সেই সূচনা ছিল বৌদ্ধ উদ্যোগে কিন্তু কোনও এক অজানা কারণে সেই গুহামন্দির সূচনার প্রায় দ'শ বছর পরে হিন্দুগুহামন্দির রূপে সম্পূর্ণ হয়। এইরকম আরো একটা উদাহরণ ১৫নং গুহা মন্দির 'দশাবতার গুহা'। পরে প্রসঙ্গক্রমে এই গুহামন্দিরের কথ ায় আসা যাবে।

যাই হোক বৌদ্ধ গুহাস্থাপত্যের কাজ যখন এগিয়ে চলেছে তার মধ্যেই শু হয়ে যায় হিন্দু গুহা স্থাপত্য খননের কাজ বৌদ্ধে াত্তর পর্যায় হিসেবে। এখানে হিন্দু গুহাস্থাপত্যের সংখ্যা সতেরোটি ১৩নং থেকে ২৯নং পর্যন্ত। ৩০ থেকে ৩৪ নং পর্যন্ত মে াট পাঁচটি জৈন গুহা স্থাপত্য খনন করা হয় নবম থেকে দশম শতক পর্যন্ত সময়কালে এবং সেই সঙ্গে ইলোরার পাহাড় ক াটা স্থাপত্য খননের সমাপ্তি ঘটে। যদিও পাহাড়ের উপরে আরো ১৮টা গুহা খনন করা আছে যার কথা পর্যটকের ম ানচিত্রে থাকে না। ঐ নির্জন গুহামালার বর্ণনা শেষ পর্যায়ে করা যাবে।
এইবার ইলোরার দক্ষিণ প্রান্তের গুহা থেকে ক্রমানুসারে উত্তর প্রান্তের গুহায় প্রবেশ করা যাক। এই ক্রমানুসারিতার সঙ্গে সময়ের সম্পর্ক অনেকাংশে থাকলেও তা নিরবচ্ছিন্ন নয়। প্রথম তিনটি গুহা আনুমানিক সপ্তম শতকের সূচনায় উৎকীর্ণ হয়। প্রথম গুহাটি বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের বসবাসের জন্য গভীর ভাবে উৎকীর্ণ। দক্ষিণ দেওয়াল কেটে এখানে করা হয়েছে চ ারটে আবাসন কুটির। এই গুহা কাকার্য খচিতনা হ'লেও অভ্যন্তরস্থ প্রস্তর গাত্র সমান্তরাল ও মসৃণ। দ্বিতীয় গুহার ডান দিকের অলিন্দে গৃহের আদলে কাটা কুলুঙ্গি সেখানে উপবিষ্ট সম্পদের দেবতা পঞ্জিকা এবং সৌভাগ্যের দেবতা হারিতি। এই দুই মূর্ত্তি অজন্তার ২নং গুহাতেও আছে, তবে তা লাবণ্যে, সুগভীর উৎকীর্ণতায় অনেক বেশী সমৃদ্ধ।

এই গুহার অলিন্দের এক ধারে উপবিষ্ট ধ্রুপদী গাম্ভীর্যমণ্ডিত বুদ্ধমূর্তির সারি। এরই মধ্যে একইরকমের আদল বিশিষ্ট হলেও কিছুটা বৃহদাকৃতির আর একটা বুদ্ধমূর্তি আলাদা ক'রে চোখে পড়ে। এই পবিত্র কক্ষের গর্ভগৃহে 'শ্রাবস্তির আশ্চর্য' সংরচনটি রয়েছে যেখানে গৌতম বুদ্ধ নিজেকে সহস্র আকারে প্রকাশ করছেন।

তৃতীয় গুহার গর্ভগৃহে বেদিকায় উপবিষ্ট ধ্যানী বুদ্ধমূর্তি এক প্রাচীন রহস্যময়তায় আবিষ্ট করে। মূর্তিটি অসমাপ্ত অবস্থায় শিল্পী ছেড়ে গিয়েছেন কোনও অজানা কারণে। এই প্রলম্বিত গুহার দেওয়ালে শ্রেণীবদ্ধভাবে উৎকীর্ণ পাত্র ও পত্র বিন্যাস।

চতুর্থ গুহাটি একটি দ্বিতল বিহার। বর্তমানে এই গুহাটির অবস্থা শোচনীয় । পার্বত্য প্রদেশের কোনও এক অজানা জলের প্রবাহপথ এই স্থাপত্যটিকে ক্রমশঃ ধবংসের পথে নিয়ে চলেছে। এই গুহার নিম্নতল মূলতঃ একটা অতিকায় সভাগৃহ। সভ াগৃহের দুপাশ দিয়ে পশ্চিম থেকে পূর্ব অভিমুখি অতিকায় খিলানশ্রেণী। পূর্ব দেওয়ালের গর্ভগৃহে শিষ্যবৃন্দ সহ উপবিষ্ট বুদ্ধমূর্তি। এই গুহার উপরি তলেও একিকই রকমের কিছুটা ছোটো আকারের গর্ভগৃহে সশিষ্যবুদ্ধমূর্তি রয়েছে।

কিছুটা বেশি উচচতায় পঞ্চম গুহাটির অবস্থান। এই অতিকায় গুহার অভ্যন্তরে এক সুপ্রশস্ত সভাগৃহ। পশ্চিম থেকে পূর্বগ ামী দুটি খিলান শ্রেণী একে তিনটি অংশে বিভক্ত করেছে। পূর্ব দেওয়ালের মাঝের অংশের দুপাশে এবং উত্তর ও দক্ষিণ দেওয়ালে অনেকগুলি ছোট ছোট কুঠরি। খিলান শ্রেণী বৃহৎপদক ও অন্যান্য ক্ষুদ্রাকৃতির অসংখ্য অলঙ্কারে বিজড়িত পত্রবিন্যাসে সুশোভিত। এই গুহায় পশ্চিম থেকে পূর্বে বিস্তৃত খিলান শ্রেণীর মাঝখানের মেঝের উপরকিঞ্চিদধিক উচচ

বেদিকার দুটি প্রলম্বিত শ্রেণী। এই দুটি প্রলম্বিত বেদিকা কি কাজে ব্যবহৃত হত তা এখন রহস্যের অন্তরালে। পূর্ব দেওয়ালের মাঝের অংশে উৎকীর্ণ গর্ভগৃহে উপবিষ্ট সালংকৃত শিরোভূষণে ভূষিত বুদ্ধমূর্তি।

ষষ্ঠ গুহাটির অভ্যন্তর বর্গাকৃতি বিশিষ্ট। এখানকার থামগুলিতে ঘটসদৃশ পাত্র ও পত্রনিবাসের নক্সার আদল। এর গর্ভগৃহে উৎকীর্ণ বোধিসত্ত্বসহ দেবী তারা ও মহাময়ুরী। এই গর্ভগৃহের প্রবেশ দ্বারে বাম দিকের পদ্ম ও জপমালা হস্তে দণ্ডায়মান অবলোকিতেশ্বর, তার স্কন্ধে শোভিত মৃগচর্ম। ডান দিকে বৌদ্ধ শিক্ষার দেবী ময়ুরপুচ্ছধারী মহাময়ুরী। গর্ভগৃহের অভ্যন্তরে পাশের দুটি দেওয়ালে ক্ষুদ্রাকৃতির বৌদ্ধ উপাসক বৃন্দের শ্রেণী। নিরলঙ্কৃত থাম। তথাপি বড় রোমাঞ্চকর লাগে এর নির্জন অন্ধকার অভ্যন্তর।

অষ্টম গুহাটি ইলোরার একমাত্র বৌদ্ধবিহার যেখানে গর্ভগৃহ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নভাবে আংশিক মধ্যস্থলে রয়েছে এবং এখানকার অন্যান্য হিন্দু গুহার মত এখানেও গর্ভগৃহকে পূর্ণ প্রদক্ষিণ করা যায়। গর্ভগৃহ যেন এখানে স্তূপের স্থান গ্রহণ করেছে। এই স্থাপত্য রীতির বিবর্তন সময়ের পরিবর্তনকে বুঝতে সাহায্য করে। এই গুহাটি অনেকগুলি বুদ্ধমূর্তি দ্বারা অলঙ্কৃত।

নবম গুহাটির গঠন অনেকটা ঝুলবারান্দা যুক্ত সমতল ছাদের ন্যায়। এর গর্ভগৃহে দেবভাবযুক্ত বুদ্ধমূর্তি। কক্ষের বাইরের দেওয়াল নানা অলঙ্কারে সুশোভিত। এখানেই রয়েছে দেবী তারা কর্তৃক ভক্তবৃন্দকে সর্প, অস্ত্র, হস্তি, অগ্নি ও জাহাজডুবি থেকে উদ্ধার করার এক অসাধারণ নাটকীয় দৃশ্যের নাতিউচ্চ রিলিফ।

দশম গুহাটি 'ঝিকর্মা গুহা' নামে পরিচিত। দেব স্থপতি ঝিকর্মার নামে এর নামকরণ। কারণ হিসেবে অনেকে মনে করেন এই গুহাটির অনুপম সৌন্দর্য ও লাবণ্য দৈবিক দৃষ্টির ভ্রমকল্প সৃষ্টি করে কিন্তু অপর একটি সম্ভাবনার কথাও অনেকে বলেন এই গুহাস্থাপত্য দাভাস্করদের দ্বারা নির্মিত এবং তাঁদের ইষ্টদেবতা ঝিকর্মা হওয়ায় এই নামে চৈত্যটি পরিচিতি পেয়েছে। ইলোরায় কাজ শু হবার বহুপূর্বে ভারহূত বা সাঁচীর বৌদ্ধ স্থাপত্যে দাভাস্কর্যের প্রকট সাদৃশ্য পাই এমন কি তার পরবর্তীকালে অজন্তার সর্বপ্রথম গুহা (২৩ন, চৈত্য) টিতে দাভাস্কর্যের গুণাবলী পরিলক্ষিত হয়। কার্লে বা পিওলখোড়ার চৈত্যেও দাভাস্কর্যের প্রকট সাদৃশ্য। যদিও পিত্তলখোড়া প্রাচীনত্বে ভারহুতের সমকালীন এবং সেক্ষেত্রে দাভাস্করদের হাতেই প্রস্তর ভাস্কর্য নির্মিত হওয়াই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে বহু প্রজন্মের অভ্যাসে যখন শিল্পীরা প্রস্তর ভাস্কর্য নির্মাণে সচ্ছন্দ হয়ে উঠেছে তখনও কেন এলোরার ১০নং গুহাটিতে দাভাস্কর্যের গুণাবলী অটুট থাকলো সেটাই ভাবার বিষয়। হয়ত কোনও বিশেষ কারণে চৈত্য স্থাপত্যের ক্ষেত্রে একটা নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে চলা হত যার জন্য ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত চৈত্যের গাঠনিক বৈশিষ্ট্যে লক্ষণীয় সাদৃশ্য বর্তমান। যাই হোক এই গুহাটির খ্যাতি বাস্তবিকই একটি অতিকায় ও অনুপম চৈত্য হিসেবে এবং ভারতবর্ষের স্থাপত্য শিল্পের ইতিহাসের এটিই সম্ভবতঃ শেষতম চৈত্যের নিদর্শন।

গুহাটির বহিরাংশ দ্বিতল, কিন্তু অভ্যন্তর এক অতিকায় চৈত্য। সভাগৃহের মাঝবরাবর দুটি অতিকায় খিলান শ্রেণী। অভ্যন্তরের দেওয়াল থেকে উদ্‌গত প্রলম্বিত খোদিত শিকারের দৃশ্য দৃষ্টিগোচর হয়। স্তূপটি এই চৈত্যের প্রায় মধ্যস্থলে রয়েছে। স্তূপের মধ্যভাগে আসনে উপবিষ্ট বুদ্ধমূর্তি। এই উপবেশন পদ্মাসনে নয়, অনেকটা চেয়ার সদৃশ আসনে উপবেশন। এই চৈত্যের স্তূপের সাথে অজন্তার ২৬নং গুহাভ্যন্তরস্থ স্তূপটির সাদশ্য লক্ষনীয়। উভয় স্তূপেরই মধ্যভাগে একই আসনে উপবিষ্ট বুদ্ধমূর্তির মধ্য দিয়ে রাজকীয় অথচ দেবত্বে উত্তীর্ণ মহামহিমতা প্রকাশ পাচ্ছে। প্রসঙ্গক্রমে বলা চলে উভয় চৈত্য নির্মাণের সময়কাল প্রায় কাছাকাছি।

এই চৈত্যের সামনের অপ্রশস্ত বারান্দার এক ধারে সোপান শ্রেণী উপরিতলে যাবার জন্য পথ নির্দেশ করেছে। উপরিতলে ঝুল বারান্দার কার্নিশে মিথুন মূর্তিতে সুশোভিত অনেকগুলি প্যানেল। এইরকম মিথুন মূর্তির প্যানেল যুক্ত রেলিং কৈলাস মন্দিরেও দেখা যায়। তবে এই মূর্তিগুলির গঠন অনেক অনুচ্চ এবং খাজুরাহো বা কোনারক মন্দিরের গাত্রে সংযুক্ত

রিলিফের সঙ্গে তুলনায় নয়। এখানে সব যেন অলঙ্কারের আভরণ মাত্র, প্রকটরূপে দৃশ্যযুক্ত নয়। উপরিতলের বাইরের দেওয়ালের মাঝখানে প্রবেশ পথটি নয়নাভিরাম কাকার্য সমন্বিত। প্রবেশ দ্বারের উর্ধাংশে প্রায় গোলাকার গবাক্ষ তার দুপাশে উড্ডীয়মানা অপ্সরাবৃন্দ। নিম্নে দুপাশে দুটো বর্গাকার প্যানেলে পরিচারিকা সহ বোধিসত্ত্বের ঈষদ্উচ্চ রিলিফ এবং দুই প্রান্তে দুই কুলুঙ্গির নিভৃতাবাসে উপবিষ্ট দেবী মূর্তি সহ বোধিসত্ত্ব।

এই ঝিকর্মা গুহা বাহিরের দৃশ্যগত সৌন্দর্যে দর্শককে টেনে আনে আর তার পর স্তূপগাত্রে খোদিত অতিকায় বুদ্ধমূর্তির মহিমান্বিত ভার কেবলি ভাবিয়ে তোলে, নিয়ে যায় পুরান রহস্যে।

অতিকায় অট্টালিকা প্রতিম একাদশ বিহারটির কাজ শেষ হয় একাদশ শতকের প্রথমার্ধে। এই গুহা স্থাপত্যটি ত্রিতল হলেও 'দোতল' নামে অভিহিত। একদা ভগ্ন পাথরের আড়ালে প্রথম তলটি সম্পূর্ণ আচ্ছাদিত থাকায় ভুল ক্রমে এই ন ামকরণ হয়। সর্বনিম্নতলে দুটি প্রকোষ্ঠ এবং মধ্যস্থলের গর্ভগৃহে শিক্ষাদান মুদ্রায় উপবিষ্ট বুদ্ধমূর্তি।

দ্বিতলে পাঁচটি অংশ খোদিত হয় প্রথম অংশটি অসমাপ্ত এবং শেষ কক্ষটিতে রয়েছে একটা পাষাণ শয্যা। মাঝের তিনটি অংশে বোধিসত্ত্ব সমন্বিত বুদ্ধমূর্তি। সর্বোচ্চ তলে স্তম্ভশ্রেণী যুক্ত অতিকায় সভাগৃহের কেন্দ্রে গর্ভগৃহ। এই কক্ষের পিছনের দেওয়ালে গণেশ ও দেবী দুর্গার পাষাণ প্রতিমা। সম্ভবতঃ এই অংশটি পরবর্তী কালে উৎকীর্ণ হয়েছে।

দ্বাদশ গুহাটিও ত্রিতল। এটি 'তিন তল' গুহা নামে অভিহিত। এখানেই বৌদ্ধ গুহাস্থাপত্যের ধারাবাহিকতার সমাপ্তি ঘটে। এর সর্বনিম্ন তলে একটি অতিকায় সভাগৃহ। এর দক্ষিণ ও উত্তর দেওয়ালে ক্ষুদ্রকায় অনেকগুলি কক্ষ এবং পশ্চিম দেওয় ালের মধ্যভাগে পবিত্র কক্ষ। এই তলের সঙ্গে দ্বিতলের সাদৃশ্য অবাক করার মতো। ত্রিতল অর্থাৎ সর্বোচ্চ তলের অতিক ায় সভাগৃহের সামনের বিস্তৃত প্যানেলে সাতটি উপশিষ্ট বুদ্ধমূর্তির সারিবদ্ধ অবস্থান। এই কক্ষের অভ্যন্তরে মুখ্য স্থান জুড়ে আছে গর্ভগৃহ যেখানে উৎকীর্ণ পদ্মাসনা দ্বাদশ দেবী মূর্তির অত্যুচ্চ রিলিফ।

একাদশ ও দ্বাদশ গুহাদুটির সামনে সুবিস্তৃত প্রাঙ্গণ। শুধু এই প্রাঙ্গণ দুটোর জন্যই কয়েক হাজার ঘন মিটার নিরেটপাথর ছেঁটে ফেলতে হয়েছে। এখানে একদা বাস করতেন চল্লিশ জন বিশিষ্ট বৌদ্ধ সন্ন্যাসী। তাঁদের শিষ্য প্রশিষ্য সমন্বিত বৌদ্ধব াণী ধবনিত হত ধীর গম্ভীর লয়ে। শান্ত সেই স্বরধবনি পাষাণে পাষাণে আঘাত প্রাপ্ত হয়ে প্রতিধবনি হত '...শরণং গচ্ছামি, সংঘং...' দর্শনার্থীর পদশব্দ আর ডানা ঝটফট কেমন বেসুরো বেজে ওঠে। বেসুরো সুরই নিয়ে যেতে চায় সুরের জগতে। পথিক, এখানে বসতে পারো দীর্ঘ সময়। চোখ আর অন্য চার ইন্দ্রিয় বহির্ভূত ইন্দ্রিয় দিয়েপ্রত্যক্ষ করো হারানো সময় আর অতীতের অতিমানবিক সৃজনশীলতার অভিঘাত।
ত্রয়োদশ গুহা থেকেই হিন্দু গুহা স্থাপত্য মালার সূচনারম্ভ। ক্ষুদ্রকায় এক কক্ষ বিশিষ্ট এই গুহাটির দেওয়ালে অলঙ্কার শে াভা নেই, নেই দেব উপাসনার স্থান। সম্ভবতঃ এইট আবাসন গুহা।

চতুর্দশ গুহাটি 'রাবন কি খাই' নামে অভিহিত। ১৩নং গুহাটির একেবারে পাশে এই গুহাটি উৎকীর্ণ হয় সপ্তম শতকে। এই গুহামন্দিরের অভ্যন্তরে রয়েছে পূর্ণ প্রদক্ষিণযোগ্য গর্ভগৃহ। গর্ভগৃহের প্রবেশ দ্বারের দুপাশে উৎকীর্ণ দ্বার পালক ও নদী দেবী। এই গুহার উত্তর ও দক্ষিণ দেওয়ালে উৎকীর্ণ রয়েছে অনেকগুলি হিন্দু দেবমূর্তির অত্যুচ্চ ভাস্কর্যের সারি। উত্তর দিকে দেওয়ালে রয়েছে দেবী দুর্গা, শ্রী দেবী ও ভূদেবী সহ উপবিষ্ঠ ভগবান বিষ্ণু এবং সপত্নি বিষ্ণর আলাদা একটা প্য ানেল। দক্ষিণ দেওয়ালে উৎকীর্ণ দেবী দুর্গা, নৃত্যরত অনুপম দেহ লাবণ্য যুক্ত অষ্টবাহু শিব, রাবণ কর্তৃক কৈলাস পর্বত উত্তোলন, ভয়ঙ্কর শিব কর্তৃক শূল বিদ্ধ অসুর অন্ধক ইত্যাদি অতি নাটকীয় পৌরাণিক ঘটনাবলী।
গর্ভগৃহের পাশে আধো অন্ধকার দেওয়ালে উৎকীর্ণ রয়েছে দন্ডায়মানা অতিকায় কঙ্কাল সদৃশ মৃতদেহধারিণী ভয়ঙ্করী চ ামুন্ডা মূর্তি ও অষ্টদেবী সহ গণেশ। চামুণ্ডার সেই ভয়াল রূপের মধ্য দিয়েই ভারতীয় শিল্পশাস্ত্র বীভৎস ও ভয়ঙ্কর রসকে

নন্দনতত্ত্বে গ্রহণ করেছে উপলব্ধি করা যায়।

বৈকালিক রক্তিম নির্জনতায় এই গুহার অত্যুচ্চ ভাস্কর্যগুলি মনের ভিতর ক্রিয়াশীল হতে থাকে। অষ্টবাহু নটরাজ মূর্তিটির স ামনে এলে বসতে হয় কিছুক্ষন, এর অনুপম দেহ ছন্দে এবং লাবণ্যে, বলিষ্ঠতায় ও গভীরতায় মহাজাগতিক প্রাণ চাঞ্চল্য প্রকাশিত। মূর্তিটির অনেক অংশই ভেঙে ফেলা হয়েছে। বিশেষতঃ উন্মুক্তভাবে উৎকীর্ণ অংশগুলো সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট করা হয়েছে (ঐ অংশগুলো তুলনায় ভাঙতে সহজ হয়েছিল)। তবু সেই প্রতিমা সম্পূর্ণ, তার গতিতে ভাঙন ধরাতে পরেনি কেউ।

গুহা পঞ্চদশ। অষ্টম শতকের মধ্যভাগে রাষ্ট্রকূট বংশের রাজা দন্তিদুর্গ, বহু সোপান উৎকীর্ণ পাহাড়ের সুউচ্চ স্থানে'দশ াবতার' নামে সমধিক পরিচিত এই গুহা মন্দির খননে পৃষ্ঠপোষকতা করেন। এই গুহাটি পূর্বে একটি বৌদ্ধ বিহার ছিল পরে এটিকে মন্দিরে রূপায়িত করা হয়। এই সময় থেকেই হিন্দু মন্দির নির্মাণ করার ব্যাপারে প্রয়োজনানুসারে বৌদ্ধগুহার নক্সা ও পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণ করা হতে থাকে। সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তাদের স্বকীয়তা যে কারণে এই মন্দিরে দেখতে পাই প্রশস্ত প্রাঙ্গণে এক প্রশস্ত উন্মুক্ত মণ্ডপ। এই মণ্ডপের দেওয়ালে উৎকীর্ণ যুগল মূর্তি এবং অভ্যন্তরে শিবের বাহন। মণ্ডপের পর সুপ্রশস্ত প্রাঙ্গণ তার পর অতিকায় দ্বিতীয় মন্দির। প্রথমে মন্দির বলে কিছুতেই মনে হয় না বিশেষতঃ সর্বনিম্নতলে অনেক খিলানের ভিতর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বারবার মনে হয় একাদশ ওদ্বাদশ বৌদ্ধ গুহার কথা। এর পর সিঁড়ি ভেঙে দ্বিতল। অকস্মাৎ চোখ পড়ে অতিকায় নৃসিংহের সংহার মূর্তিটি। হিরণ্যকশিপু ও নৃসিংহের দৈহিক বিন্যাস ও ছন্দ অ াকস্মিকভাবে বিহ্বল ক'রে তোলে। অতিকায় এই মণ্ডপের উত্তর ও দক্ষিণ দেওয়ালে বিপুলাকার ভাস্কর্যের সারি। দক্ষিণ দেওয়ালের উৎকীর্ণ নৃসিংহ সহ ভগবান বিষ্ণুর দশাবতার এবংব্যাপকার্থে পুরাণের দৃশ্যবলী। দক্ষিণাবর্তাশীলভাবে বাম দেওয়ালের শুতে শিব কর্তৃক অসুর অন্ধককে শূল বিদ্ধকরণ, শিব ও পার্বতীর পাশা খেলা, শিব পার্বতীর বিবাহ, জ্যো র্তিলিঙ্গ থেকে বিনির্গত হ'য়ে শিব কর্তৃক মার্কণ্ডের উদ্ধার এবং শিব কর্তৃক গঙ্গাকে ধারণের দৃশ্য দেখতে দেখতে সময় কেটে যায়। এ যেন অন্য পুরাণ পাষাণ পুরীর পুরাণ।
এবার চলেছি শ্রেষ্টতম ও বৃহত্তম পাহাড় কাটা এক প্রস্তর স্থাপত্য সন্দর্শনে যেখানে দক্ষতা, প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতা, বলিষ্ঠতা, সেকালের সকল ধ্যান-জ্ঞান-তপস্যা আপেক্ষিক ও শাশ্বত সত্যের মহা সম্মেলন ঘটেছে, সেই মহান গুহা স্থাপত্য (১৬নং) 'কৈলাসনাথ' মন্দির। কৈলাস হ'ল সেই পাহাড় যেখানে হিন্দু দেবতা শিব অধিষ্ঠান করেন সেই শিব স্মরণে রচিত এই অনিন্দ্যসুন্দর মহাকাব্যিক মন্দির স্থাপত্যের কাজটি সম্পূর্ণ হয় রাষ্ট্রকূট রাজা প্রথম কৃষ্ণের পৃষ্ঠপোষাকতায় সময়কাল অষ্টম শতকের মধ্যভাগ। প্রায় একশ বছর ধ'রে এই মন্দির উৎকীর্ণ করার কাজ চলে।
এই মন্দির উৎকীর্ণ করা শু হয়েছিল পার্বত্য প্রদেশের উপরিতল থেকে। পরিকল্পনা অনুযায়ী কাটতে কাটতে ক্রমশঃ নীচের দিকে নেমেছে।

মন্দিরের বাইরের অংশ প্রাকারযুক্ত তোরণদ্বার। বাহির থেকে এই প্রাচীর দেখলে ধারণা করা না এর অভ্যন্তরে কোন্ সৌন্দর্য্য লুকিয়ে থাকতে পারে। বাহিরের দেওয়ালে উচ্চ- উৎকীর্ণ ভাস্কর্যে পৌরাণিক চরিত্রাদির মহামহিম দেবত্ব।মন্দিরে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে সম্মুখবর্তী পদ্ম পত্রাকীর্ণ জলরাশির মাঝে পদ্মাসনা দেবী কমলার উচ্চ উৎকীর্ণ ভাস্কর্য দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়। তার পর চোখ তাকাবে কোথায়! যেখানে দুচোখ যায় সেখানেই মহার্ঘ দৃশ্য রচিত হয়ে আছে। নান্দি মণ্ডপের দুপাশে সালঙ্কৃত সুউচ্চ (১৭ মিটার) এক প্রস্তর স্তম্ভ। স্তম্ভ শীর্ষে প্রস্তরোৎকীর্ণ ত্রিশূল যে স্তম্ভ দুটির নিচে উচ্চ বেদিকায় দণ্ড ায়মান দুটি প্রমাণাকার হস্তিমূর্তি। যদিও পাথরে ক্ষয় রোগ ও মানুষের অনান্দনিক বিক্রমে দক্ষিণ দিকের হাতির মূর্তিটিকে চেনা যায় না।

বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণের চার পাশে ঘিরে রয়েছে খিলান শ্রেণী যুক্ত বারান্দা। উত্তর দিকের বারান্দার দেওয়ালে উৎকীর্ণ রয়েছে দণ্ড ায়মানা তিন নদী দেবী । মধ্যস্থলে সমভঙ্গ গঙ্গাকে রেখে দুপাশে দ্বিভঙ্গ যমুনা ও সরস্বতী। স্বর্গীয় লাবণ্য কেমন ক'রে অমসৃণ

পাষাণে মূর্ত হ'তে পারে ভাবতে বিস্ময় জাগে। এই পবিত্র কক্ষের ঠিক পরেই দ্বিতলস্থ 'লঙ্কের মন্দির। এখানে চারপাশে ঐর্যমণ্ডিত পাষাণ প্রতিমা আর সালঙ্কৃত খিলান শ্রেণী। মূল মন্দিরের পশ্চাতে বিস্তৃত প্রাঙ্গণের পর আবার এই সুবিস্তৃত খিল ান শ্রেণী যুক্ত বারান্দা। প্রাঙ্গণের উপর ঝুলন্ত সুউচচ পাহাড় খাড়া ভাবে উঠে গেছে। এ সব কিছুই যে মনুষ্য সৃষ্ট ভাবতে শরীর রোমাঞ্চিত হয়। মনুষ্য সৃষ্ট সুউচচ গিরিখাতে ছন্দবদ্ধ ছেনি বাটালীর দাগ চলেছে অবিরাম গতিতে সেই দিকে তা কিয়ে থাকি, দেখতে থাকি মনুষ্য সৃষ্ট আকাশ,যে আকাশ আমার শরীর ঘিরে আছে।

পশ্চিমমুখী মূল মন্দির উত্তোলিত হয়ে আছে নিরেট নিম্নতলের উপর। নিম্নতল বা ভিত্তিভূমির দেওয়ালে উচচ উৎকীর্ণ - হা তি, সিংহ ও পুরাণ পশুর দঙ্গল যেন তারাই মূল মন্দিরের ভার বহন করছে। মন্দিরের দ্বিতলে যাবার জন্যদু'পাশ থেকে সে াপান শ্রেণী এসে মিলেছে। ষোলোটি স্তম্ভ যুক্ত মূল মণ্ডপের সামনে। মূল মণ্ডপের অভ্যন্তরে অগনন উৎকীর্ণ আলপনা। মন্ডপের ছাদে নটরাজ মূর্তি। তারপর সামনে পশ্চিমমুখী গর্ভগৃহ। এই মণ্ডপের দুপাশে ঝুলবারান্দা সেখানে যাবার জন্য প্রশস্ত দ্বার। দুই দ্বারেরই দুপাশে অতিকায় দন্ডধারী দ্বারপাল। ঝুল বারান্দার থাম দুটিও অলঙ্কারে সুশোভিত। গর্ভগৃহের দুপাশে দুটি দ্বার দিয়ে আর একটি প্রাঙ্গণে আসা যায় সেখানে রয়েছে আরো চারটি নাতিদীর্ঘ মন্ডপ।মূল মন্ডপ থেকে বেরিয়ে পশ্চিম অভিমুখি দুটি সেতু দুটি নান্দীমন্ডপের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করেছে।

ভাস্কর্য উৎকীর্ণ অগনন স্থানে। মূল মন্দিরের দুপাশের দেওয়ালে উৎকীর্ণ রামায়ণ মহাভারতের নাতিউচচ রিলিফ। মূল মন্দিরের ভিত্তিভূমিতে রাবণ কর্তৃক কৈলাশ পর্বত উত্তোলনের অপূর্ব অত্যুচচ ভাস্কর্য। মন্দিরের গায়ে অনেক উড্ডয়নশীল মূর্তি যাদের বস্ত্র বায়ু প্রবাহের দিক নির্দেশ করছে। সেতুর তলদেশে অতিকায় অষ্টভুজ শিবের সংহার মূর্তি। ভাস্কর্য আছে এখানে অনেক। কোনটা ভাস্কর্য নয় সেটাই প্র হ'য়ে ওঠে। এই মন্দির কি আদ্যোপান্ত এক ভাস্কর্য নয় ?নয় কি এক অতিকায় ত্রিমাত্রিক নক্সা ? বস্তুত এ এত মহৎ সম্মেলন। এই সম্মেলনেরই নাম কৈলাস নাথ মন্দির। চারপাশে শিল্প শোভা ঘিরে অ াছে। ঘিরে আছে আকাশ। পাহাড়ের উত্তর থেকে প্রায় ত্রিশ মিটার গভীর মন্দির প্রাঙ্গণের দিকে তাকাতেই বিস্ময় লাগছে। এই প্রাঙ্গণ উন্মুক্ত করতে অন্ততঃ ত্রিশ হাজার ঘনমিটার নিরেট ব্যাসল্ট পাথর কাটতে হয়েছে।

বস্তুতঃপক্ষে কৈলাসনাথ মন্দির ভারত তথা বিশ্বের শিল্পকলার ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব বিস্ময়। মন্দিরের মূল মণ্ডপে দাঁ ড়িয়ে আছি পশ্চিমাঞ্চল গামী সূর্য দেখা যাচ্ছে সামনেরি দুটি নান্দী মন্ডপের মাঝখান দিয়ে। সূর্যের আলো প্রবেশ করেছে গর্ভগৃহের বিগ্রহে। কতকাল এমন ক'রে সন্ধ্যারবি প্রবেশ ক'রে চলছে গর্ভগৃহে। কতকাল মানুষ বিস্মিত হয়েছে। আর কতক াল হবে কে জানে।

কৈলাশ মন্দরের পর ক্রমানুসারে সতেরো, আঠারো, উনিশ এবং কুড়ি তম যে গুহা মন্দিরগুলি রয়েছে সেখানে দর্শনার্থীরা যায় কম। গুহাগুলি নির্জন থাকে অধিকাংশ সময়। লেখক ইলোরা কথা লিখতে গিয়ে কৈলাস মন্দিরের বন্দনায় মুখর হ'য়ে পড়লেও একথা লিখতে বাধ্য হচ্ছে ইলোরার প্রতিটি গুহারই অনন্য ভূমিকা রয়েছে। ইলোরা মানে শুধু পাহাড় কাট া স্থাপত্য আর তার অভ্যন্তরস্থ উৎকীর্ণ ভাস্কর্য শ্রেণীই নয়, সেই অভূতপূর্ব সৃষ্টি চাক্ষুষ দর্শনের মধ্যে ক্লান্তি আর অবসন্নত াও আছে। চোখের দেখাকে ধীরে ধীরে স্তিমিত ক'রে অন্তরে তাকে দেখার সুযোগ আসে পার্বত্য পাদদেশের নির্জন গুহ াগুলির সৌম্য স্নিগ্ধতায়। উক্ত গুহাগুলি সেরকমই ধ্যানগম্ভীর নির্জনতার আশ্রয়।

হিন্দু গুহা মন্দিরের মধ্যে অন্যতম উল্লেখযোগ্য একুশতম গুহাটি 'রামের' নামে পরিচিত। এটা অন্যতম প্রাচীন মন্দির (অ ানুমানিক সপ্তম শতকের সূচনা)। মন্দিরের সম্মুখভাগের উৎকীর্ণ প্রাঙ্গণে উচচ ভিত্তিমূলে এক প্রস্তর নন্দী। এই মূর্তি মন্দিরের বারান্দার দিক নির্দেশ করেছে। বারান্দার উত্তরে বাইরের দেওয়ালে উৎকীর্ণ কমনীয় ভঙ্গীতে দণ্ডায়মানা মকরবা হিনী গঙ্গাদেবী এবং দক্ষিণ দেওয়ালে প্রায় একই ভঙ্গিতে দন্ডায়মান যমুনাদেবীর অত্যুচচ ভাস্কর্য।

মন্দিরের অভ্যন্তরের উত্তর দেওয়ালে উৎকীর্ণ শিব ও পার্বতীর বিবাহদৃশ্য, দেব সেনাপতি কার্তিকেয় এবং দুর্গা, নৃত্যরত শিব ইত্যাদি। দক্ষিণ দেওয়ালে উৎকীর্ণ সাত মাতৃকা দেবীর সঙ্গে উপবিষ্ট গণেশ এবং বীণা হস্তে শিব। সেই সঙ্গে মৃতদেহের আসনে আসীন ভয়ঙ্কর কঙ্কাল সদৃশ কাল ও কালী মূর্তি।

'রাম্মের' মন্দিরের কিছুটা উত্তরে বাইশ নং গুহা, সেখানেও উন্মুক্ত নন্দী মন্ডপ। তার পর তেইশ থেকে আঠাশ নং পর্যন্ত মন্দিরগুলিতে পুরাতন নির্জনতা। পঁচিশ নং গুহাটিতে সূর্য দেবতার মূর্তি উৎকীর্ণ আছে। সাতশ থেকেঊনত্রিশতম গুহ ামন্দির 'ধমার লেনা'তে যাবার জন্য পার্বত্য খাদ অতিত্রম কবার সময় পথে ক্ষুদ্রকায় আঠাশতম গুহাটি চোখে পড়ে।

'ধমার লেনা' নামে পরিচিত ঊনত্রিশ তম গুহাটি ইলোরার সামগ্রিক গুহা স্থাপত্য মালার মধ্যে প্রাচীনতম। এই গুহা উৎকীর্ণ করার কাজ আরম্ভহয় ষষ্ঠশতকের প্রারম্ভে। পারে নানা সময়ে আরো কিছু অবয়ব উৎকীর্ণ করা হয় এবং অষ্টম শতকে এই গুহার কাজ শেষ হয়

এই গুহাভ্যন্তরস্থ গর্ভগৃহের চারিটি প্রবেশ পথ, প্রতিটি প্রবেশ পথের দুপাশে পরিচারিকাসহ অতিকায় দ্বারপাল মূর্তি । এই গুহা অতিকায়, মন্দিরের ভাস্কর্যগুলি বিশালাকার। সম্ভবতঃ এই মন্দিরে হোম হ'ত যে কারণে দুটো হোম কুণ্ড দেখতে প াওয়া যায়। যদিও হোমকুণ্ড দুটির অপকৃষ্ট উৎকীর্ণতা পরবর্তী যুগকে নির্দেশ করে।
এখানে রয়েছে অষ্টভুজ অতিকায় নৃত্যরত শিবমূর্তি, দন্ডধারী শিব ও হর পার্বতীর উপবিষ্ট মূর্তি সকল। প্রবেশ দ্বারের দুপ াশের সিংহ মূর্তিতে মিশ্র সংস্কৃতির লক্ষণ সুস্পষ্ট।

জৈন গুহা স্থাপত্য শ্রেণীর মধ্যে প্রথম পাহাড়ের অভ্যন্তরে লুক্কায়িত নির্জন এই গুহাটি (ত্রিংশত) 'ছোটা কৈলাশ' নামে পরিচিত। কারণ এখানে কৈলাশ মন্দিরের ক্ষুদ্র সংস্করণের রূপ লুকিয়ে আছে. মন্দিরে উৎকীর্ণ-অলঙ্কার মালায় জৈন সন্ন্য াসী এবং দেবী মূর্তি রয়েছে। বাইশ জন উপবিষ্ট তীর্থঙ্করের মূর্তি মণ্ডপের প্রতি দিক নির্দেশ করেছে। সেখানে সিংহাসনে উপবিষ্ট মহাবীর।

এই অনুপম স্থাপত্য কর্মটি কোনও অজানা কারণে অসম্পূর্ণ রেখে শিল্পীরা চলে গিয়েছেন। তবে মন্দিরটি দেখলে কৈলাশ মন্দির উৎকীর্ণ করার পদ্ধতি অনেকাংশেই বোধগম্য হয়। মন্দিরের শীর্ষদেশ থেকে খননকার্য শু হয়ে সুচারু অলঙ্করণ স ম্পূর্ণ করতে করতে ত্রমশঃ নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে যেন। নামতে নামতে হঠাৎ ক'রেই থমকে গেছে অর্ধপথে। মন্ডপে জড়িয়ে আছে সংকীর্ণ সোপান শ্রেণী যেন উপরের আরো কিছু কাজ শেষ কররার পরেই ছেঁটে ফেলা হবে। মণ্ডপের শরীর জুড়ে উৎকীর্ণ অলঙ্কার। এবড়ো খেবড়ো মেঝে যেন হতে চায় আরো নিম্নমুখী।

একত্রিশতম গুহটি বত্রিশতম গুহার প্রসারিত অংশ হবার সম্ভবনায় থাকলেও বাস্তবে তা আর সম্ভবপর হয়নি। অকস্মাৎ দেখে মনে হয় ক্ষুদ্র খাদের ভিতর যেন সংগোপনে থাকে, আত্মপ্রকাশে একান্তই অনিচ্ছুক এক গুহা। প্রাচীন নীরবতা যেন এইখানে অবস্থান করে।

সূক্ষ্ম কাকার্য খোদিত এই দ্বিত্রিংশতি গুহা স্থাপত্য 'ইন্দ্রসভা' নামে অভিহিত। জৈন গুহা স্থাপত্যের সঙ্গে হিন্দু গুহা মন্দিরের অনেক সাদৃশ্য পাওয়া যায়। এই গুহার মধ্যস্থলে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণের ধার ঘেঁসে সিংহ ও হাতির কাকার্য মন্ডিত প্রলম্বিত শ্রেণী এরং এই প্রাঙ্গণের কেন্দ্রস্থলে উন্মুক্ত গর্ভগৃহে তীর্থঙ্করগণের মূর্তি। এই পারাঙ্গণের সামনে দ্বিতল মন্দির। নি ম্নতলে অসমাপ্ত মন্ডপে গঠিত হয়েছে কিছু অসমাপ্ত কক্ষ। উপরিতলে সমআকৃতি বিশিষ্ট খিলানশ্রেণী যুক্ত মন্ডপ যা অনেক াংশেই সম্পূর্ণ। পূর্ব দেওয়ালের মধ্যস্থলে রয়েছে গর্ভগৃহ। এই মন্দিরের দক্ষিণ দেওয়ালের দেবী অম্বিকার ভাস্কর্যটি নয়ন মনোহর। তিনি ব্যাঘ্রাসনা এবং তার মস্তকোপরে ছত্র সদৃশ আম্রবৃক্ষের ফল ও পত্র বিন্যাস। এই মূর্তিটির বিপরীত দেওয়

ালে হস্তিপৃষ্ঠেআসীন ইন্দ্রের মূতি। তাঁর মাথায় বৃক্ষের ছত্রসদৃশ পত্র বিন্যাস। তাঁরদুপাশে দুই পরিচারিকা। এছাড়াও স্তম্ভ গাত্রে উৎকীর্ণ রয়েচে মহাবীর, প্রথম তীর্থঙ্কর আদিনাথ পুত্র গোমত্তের এবং পার্শ্বনাথ। এই মন্দিরের দ্বিতলে অনেক চিত্রও রচিত হয়েছিল তার বহু প্রমাণ আজও বর্তমান।

তেত্রিশ নং গুহাটি 'জগন্নাথ সভা' নামে পরিচিত। এই দ্বিতল গুহার অভ্যন্তরে পাঁচটি খিলানযুক্ত উন্মুক্ত গর্ভগৃহ। মন্ডপ ও গর্ভগৃহ দুটি তলেই উৎকীর্ণ। এই গুহার দ্বিতলের সঙ্গে বত্রিশ নং গুহার দ্বিতলের সহজ সংযোগ রয়েছে।

ইলোরার উত্তর প্রান্তের জৈন গুহা স্থাপত্য অঞ্চলের মধ্যে সর্বশেষ এবং ছোট গুহাটির (চৌত্রিশ নং) গর্ভগৃহের দ্বারের দুপাশে মাতঙ্গ এবং সিদ্ধিকার মূর্তি উৎকীর্ণ। গর্ভগৃহের অভ্যন্তরে মহাবীরের মূর্তি সহস্র বৎসর উপবেশনে আছেন। এই সব পুরাতন পাথর পুরাতন খোদিত অবয়ব ক্রমাগত নিয়ে যায় সেই পুরাতনে, সেই সব অতীতমুখী বাস্তবতায় ।সেখানে ত ারা প্রাণ পায়। সেইসব পাষাণ নিশ্বাস ছাড়ে। অস্তাচলগামী সূর্যের রক্তিম আভা পাষাণে মিশে যায়। মিশেযায় উৎকীর্ণশরীরে। আর পাহাড়ের উপরে যেখান থেকে নেমে আসে ঝর্ণাধারা, তার দুই পাশে আরো আঠারোটা ক্ষুদ্র াকৃতির গুহামন্দিরের অভ্যন্তরস্থ বিগ্রহে এখনও মানুষ সিঁদুর লেপন করে। এখনও সেইখানে যেন জাগ্রত দেবতা বাস করে। যে দুর্গম পার্বত্য নির্জনতায় মানব সভ্যতার কথা মালা ছিল না একদিন। ছেনিবাটালীর আঘাত স্থানদিল তাকে ইতিহাসে। সূর্য ডোবার সাথে সাথে রং মুছে যায়। মুছে যায় সময়ের সুদীর্ঘ ব্যবধান। সহাস্রাধিক আলোকবর্ষ দূরের নক্ষত্র জগৎ থেকে কেউ যদি এখানে তাকায় দেখতে পাবে পাহাড় কাটা মানুষের দল ফিরে আসছে এই নির্জন গুহামালার পথে। জ্যোৎস্নালোকে তারা পথ চিনে চলেছে আগামীর দিকে।